| সম্পাদকীয় |

খেয়ে-পরে বাঁচার প্রশ্ন

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় পুরোটাই তৈরি পোশাক খাতনির্ভর। এই খাত ক্রমে সম্প্রসারিত হচ্ছে, রপ্তানির পরিমাণ বাড়ছে, মালিকদের আয় এবং সম্পদ বাড়ছে, কিন্তু মজুরি নিয়ে শ্রমিকের অসন্তোষ কমছে না। ফলে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ, আন্দোলন-সংগ্রাম এ দেশে নতুন নয়। মঙ্গলবার দেশ রূপান্তরে প্রকাশিত 'বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের দুজন লাশ' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সোমবার গাজীপুর ও সাভার-আশুলিয়ায় বিক্ষোভ করেছেন তৈরি পোশাক শ্রমিকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ রাবার বুলেট, টিয়ার শেল নিক্ষেপসহ লাঠিচার্জ ও জলকামান ব্যবহার করে। এ ঘটনায় দুজন শ্রমিক নিহত ও বহু হতাহত হয়।

প্রসঙ্গত, ন্যূনতম ২৩ হাজার টাকা বেতনের দাবিতে বিভিন্ন কারখানার পোশাক শ্রমিকরা বেশ কিছুদিন ধরেই আন্দোলন করছিলেন। আন্দোলনরত এক শ্রমিক দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'বর্তমান বাজারে সবকিছুর দাম বাড়লেও আমাদের বেতন বাড়েনি। আমাদের মাসে ৮ হাজার টাকার মতো বেতন দেওয়া হয়। তিনজনের সংসারে এই টাকায় সংসার চালানো যায় না।' আমরা মনে করি ওই শ্রমিকের কথার ন্যায্যতা রয়েছে। অথচ শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ন্যায্য মজুরির দাবি তুললেই সেই দাবিকে প্রথমে 'অযৌক্তিক' বলে বাতিল করার চেষ্টা করা হয়।

দেশ রূপান্তরেই 'ষড়যন্ত্রের গন্ধে উদ্বিগ্ন সরকার' শিরোনামে প্রকাশিত আরেকটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, চলমান রাজনৈতিক আন্দোলনে হঠাৎ করে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের আরেকটি ভিন্ন কৌশল বলে দাবি করেছে ক্ষমতাসীনরা। কিন্তু গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকেই জানা যায়, পোশাক শ্রমিকদের চলমান আন্দোলন গত কয়েক মাস ধরে চলছে। গত ৮ অক্টোবর পোশাকশিল্পের শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি ১৭ হাজার ৫৬৮ টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি। দেশের তৈরি পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরি নিয়ে ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকরাও প্রশ্ন তুলেছেন। তারা বলেছেন, ৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি মোটেও ভালো মজুরি নয়। আর কতদিন এ মজুরি থাকবে, সেটাই জরুরি প্রশ্ন।

তবে, এ কথাও সত্য যে দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনে অনেক সময় দেখা গেছে, শ্রমিক আন্দোলনও সংঘটিত হয়েছে। সর্বশেষ ২০০৬ সালের ২০ মে গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলন সংঘটিত হয়। যা তৎকালীন সরকারকে বেশ বেকায়দায় ফেলে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, কয়েক মাস ধরে চলমান পোশাক শ্রমিকদের আন্দোলনকে সরকার আগেই কেন বিবেচনায় নিয়ে নিয়ন্ত্রণ করল না? এই আন্দোলন চরম আকার ধারণ করতে দেওয়া হলো? বিজিএমইএ জানিয়েছে, পোশাক শ্রমিকদের নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণা করা হবে নভেম্বরে। ডিসেম্বর থেকে এই মজুরি কাঠামো কার্যকর করা হবে। আমরা আশা করব মূল্যস্ফীতির বর্তমান বাজারে পোশাক শ্রমিকদের এমন মজুরি নির্ধারিত হোক যেন তারা অন্তত খেয়ে-পরে বাঁচতে পারেন।

পোশাকশিল্পে চীনের ৩০৩ ডলার, ভারতের ১৭১ ডলার, ভিয়েতনামের ১৭০ ডলারের গড় মজুরির বিপরীতে বাংলাদেশের গড় মজুরি মাত্র ৭২ ডলার। গত এক দশকের সব আন্তর্জাতিক সূচকে বাংলাদেশের গড় মজুরি শুধু দক্ষিণ এশিয়া নয় বরং আফ্রিকাসহ বিশ্বে সর্বনিম্ন। শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরির যে দাবি করেছেন তা ভারত ও ভিয়েতনামের গড় মজুরির চেয়েও ১০-১১ ডলার কম। কিন্তু উভয় দেশের নিত্যপণ্যের দাম বাংলাদেশের চেয়ে তুলনামূলকভাবে সস্তা। বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্পে বিশ্বে দ্বিতীয়, সে প্রথম হতে চায় কিন্তু মজুরি দিতে চায় না।

গার্মেন্টস শ্রমিকসহ শ্রমজীবীদের ন্যায্য মজুরির প্রশ্ন উঠলেই নানা অজুহাতে মজুরি বৃদ্ধির দাবিকে আড়াল করার চেষ্টা চলে। বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর মজুরি নির্ধারণ করার কথা। কিন্তু বাস্তবতা হলো পাঁচ বছরে দ্রব্যমূল্য, টাকার মান, জীবনযাত্রার ব্যয় এক জায়গায় স্থির থাকে না। একটি পরিবারের টিকে থাকার সামগ্রী দিয়ে নিম্নতম মজুরির হিসাব করা হয়। তাই নিম্নতম মজুরি কোনো যুক্তিতেই দারিদ্র্যসীমার আয়ের নিচে হতে পারে না। শ্রমিকের প্রত্যাশা অনুযায়ী মজুরি দিলে মালিকের লোকসান হবে না কিন্তু উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত বিশাল জনগোষ্ঠী তাদের জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারবে। তা না হলে রপ্তানি বাড়বে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে অসন্তোষ। আর উন্নয়নের পেছনে থাকবে বঞ্চিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস যা জন্ম দেবে বিক্ষোভের।

১২

বিশ্বব্যাংক ও ব্রাক আয়োজিত কনফারেন্সে জানানো হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি এড়াতে বাংলাদেশে বছরে সাড়ে ১২ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রয়োজন।

এই দিনে

১ নভেম্বর

নাট্যকার রায়বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম ১৮৩০ সালে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়ায়। গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন শেষে স্থানীয় জমিদারের সেরেস্তায় ১৮৪০ সালে মাসিক আট টাকা বেতনে চাকরি শুরু করেন। কিন্তু তার মধ্যে ছিল উচ্চশিক্ষা লাভের তীব্র বাসনা। তাই পাঁচ বছর চাকরি করার পর তিনি চলে যান কলকাতায়। কলকাতায় পড়াশোনার খরচ জোগাতে তাকে গৃহভৃত্যের কাজ করতে হয়েছে। প্রথমে তিনি রেভারেন্ড জেমস লংয়ের অবৈতনিক স্কুলে ভর্তি হন এবং এ সময়ই তিনি দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। পরে তিনি ভর্তি হন হেয়ার স্কুলে। সেখান থেকে ১৮৫০ সালে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় পাস করে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। কলেজের সব পরীক্ষায় তিনি বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৫৫ সালে তিনি পাটনায় পোস্টমাস্টার পদে যোগদান করেন। পরে তিনি সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল হন। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার তাকে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৮৭২ সালে তিনি ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ইন্সপেক্টর পদ লাভ করেন। কলেজে পড়ার সময়ই ঈশ্বরগুপ্তের সংস্পর্শে গিয়ে সংবাদ প্রভাকর, সাধুরঞ্জন প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। তবে নাটক ও প্রহসন লিখেই তিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন। নীলদর্পণ তার শ্রেষ্ঠ নাটক। তাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার মনে করা হয়। ১৮৭৩ সালের ১ নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আজকের শব্দজট

১					
			২		৫
৩	৬				
			৪		

গতকালের সমাধান

আ	দা	ল	ত		র
না					ব
র			তি	মি	র
স					বা
	মা	শু	ল		
		র			

সমাধান সংকেত

পাশাপাশি
১. পূর্ণচাঁদ
২. জলচর বড় পাখি
৩. তরুশ্রেণি, গাছেঘেরা পথ
৪. শাসক, রাজপ্রতিনিধি

ওপর-নিচ
১. সন্ধ্যার রাগবিশেষ
৪. ঝরনা, জলধারা
৫. হ্রদ, বড় জলাশয়
৬. নাট্যশালা, নাট্যাভিনয়

আজকের ধাঁধা

দেখিতে আশ্চর্য বড়
মা ছোট তার ছেলে বড়
উত্তর : আগামীকালের পত্রিকায়
গতকালের উত্তর : সর্দি

তারা এখন টাকার বদলে ডলারে 'ঘুষ' নিচ্ছেন

গোবিন্দ শীল

বাংলাদেশে ডলার কেনাবেচার দুটি বাজার রয়েছে। প্রথমটি ব্যাংকের আওতাধীন 'অফিশিয়াল' বাজার আর দ্বিতীয়টি হলো বেসরকারি বা 'আন-অফিশিয়াল' বাজার। অফিশিয়াল বাজারে মূলত আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের জন্য ডলারের কেনাবেচা হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এই বাজারে ডলারের মূল্যমান নির্ধারণ করে থাকে। আমাদের আলোচনা আন-অফিশিয়াল বা কার্ব মার্কেটে সম্প্রতি ডলারের চড়ামূল্য নিয়ে। এই বাজারটি থেকে বিদেশগামী নাগরিক, বিদেশে চিকিৎসা করাতে গমনেচ্ছু মানুষ ডলার কিনে থাকেন। বিদেশে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরাও এই বাজার থেকে ডলার কিনে নিয়ে যান। মার্কিন অর্থনীতির গতিবিধি ভালো হলে এবং বিশেষত মার্কিন ডলারের তুলনামূলক দাম বাড়লে অন্য সব দেশে ডলারের দাম বাড়তে পারে। সেক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভে থাকা ডলার অফিশিয়াল বাজারে ছেড়ে দিয়ে এই দাম স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করা হয়। এর কিছুটা প্রভাব কার্ব মার্কেটেও গিয়ে পড়ে। দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সেপ্টেম্বর মাসে ২৩ বিলিয়ন (আইএমএফ-এর সূত্র অনুযায়ী) ডলারে নেমেছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক দাবি করছে বিনিয়োগ তহবিল ও ঋণ হিসাব তহবিল মিলিয়ে মোট রিজার্ভের পরিমাণ ২৯.২০ বিলিয়ন ডলার।

গত বছর বাংলাদেশের রিজার্ভের অঙ্ক ছিল ৪৮ বিলিয়ন ডলার। মেগাপ্রকল্পে নেওয়া ঋণের সুদ (debt servicing) ও পেট্রোলিয়াম পণ্য কিনতে গিয়ে ডলারের ওপর মারাত্মক চাপ তৈরি হয়। কমতে থাকে রিজার্ভ। দ্রুত ডলারের রিজার্ভ কমে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসজাত পণ্যের আমদানি অনুৎসাহিত করেছে। এসব পদক্ষেপ নেওয়ার কারণে দেশের কার্ব মার্কেটে ডলারের দাম ১১৮ থেকে ১২০ টাকা পর্যন্ত উঠে গেছে। তবে, আমদানি পণ্যের হিসাব খোলার জন্য ব্যাংকগুলো মোটামুটি ১১২ টাকায় ডলার বিক্রি করছে।

> যতদিন কার্ব মার্কেট (কালোবাজার) বলে একটি মার্কেট থাকবে, ততদিন ডলারের দু'রকম মূল্যও থাকবে। আর কার্ব মার্কেটের ডলারের সরবরাহ আসবে মূলত হুন্ডিওয়ালাদের কাছ থেকে। ফলে এখানে বেশি মূল্যে ডলার কিনতে হবে

কার্ব মার্কেটে ডলারের দাম এত বেশি কেন?

যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি নিয়েই মানি চেঞ্জার কোম্পানিগুলো ব্যবসা চালিয়ে আসছে, বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্য কোনো তফসিলি ব্যাংক মানি চেঞ্জার কোম্পানিগুলোর কাছে কোনো ডলার, ইউরো বা পাউন্ড স্টার্লিং বিক্রি করে না। তাহলে, এসব কোম্পানি ডলার পায় কোথা থেকে? কোম্পানিগুলো বলছে, বিদেশ ফেরত ও প্রবাসী ব্যক্তিদের কাছ থেকে তারা ডলার বা ইউরো ইত্যাদি কিনে থাকেন। বাংলাদেশ থেকে শুধুমাত্র ভারতে বেড়ানো ও চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মাসে এক লাখেরও বেশি পর্যটক দেশটিতে যাচ্ছেন। একজন ব্যক্তি গড়ে ৫০০ ডলার সঙ্গে নিলে এক লাখ ব্যক্তি মাসে ৫ কোটি ডলার বা বছরে ৬০ কোটি ডলার শুধুমাত্র ভারতে খরচ করছেন। আর বাংলাদেশ থেকে বছরে বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী বিদেশে পড়াশোনার জন্য যাচ্ছেন। এরা মূল খরচ যেমন টিউশন ফি ও হোস্টেল খরচ ইত্যাদির জন্য এক সেমিস্টারের বিপরীতে অন্তত ৬ থেকে ৯/১০ হাজার ডলার দেশের ব্যাংকগুলো থেকে কিনলেও কিছু ডলার মানি এক্সচেঞ্জ থেকেও সংগ্রহ করছেন। এর বাইরে ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে মানুষ ভ্রমণ, চিকিৎসা ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লাখ লাখ ডলার সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন। এই লেখকের পরিচিত এক ব্যক্তি গত সপ্তাহে তার বিশেষ ধরনের চিকিৎসার জন্য ৩০ হাজার ডলার ভারতে নিয়ে গেছেন। এখন খুব কম মানুষই ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ভ্রমণ বা চিকিৎসার জন্য ডলার কিনতে পারছেন। দেশের নানাবিধ শিল্পের আমদানিকারকরা ডলার সংকটের কারণে ঠিকমতো এলসি (ঋণপত্র) খুলতে পারছেন না বলে ক্রমাগত রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, যেসব ব্যক্তি ভ্রমণ শেষে বাইরে থেকে ফিরে আসছেন, তাদের ফেরত আনা ডলার দিয়ে কি মানি এক্সচেঞ্জগুলো ব্যবসা করে? এর পরিমাণ তো খুব বেশি নয়। এদিকে, প্রবাসী শ্রমিকরা বাড়িতে বেড়াতে আসবার সময় অথবা একেবারে দেশে ফিরে যখন আসছেন, তখন কিছু রিয়েল, পাউন্ড স্টারলিং, ডলার, দিনার ইত্যাদি সঙ্গে আনছেন। কিন্তু বেশিরভাগ অংশই হয় ব্যাংকিং চ্যানেল না হয় হুন্ডির মাধ্যমে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। অর্থাৎ, মানি এক্সচেঞ্জের যে চাহিদা তা কি শুধু বিদেশ ফেরত শ্রমিক বা সফরকারী ব্যক্তির ফিরিয়ে আনা ডলার দিয়ে মেটানো সম্ভব? তাহলে, মানি চেঞ্জাররা ডলার পাচ্ছেন কোথা থেকে। বাংলা প্রবাদটি এখানে যথেষ্ট জুতসই– ভাসুরের নাম মুখে নিতে নেই। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক মানি চেঞ্জারের মালিক/ ম্যানেজাররা বলছেন, 'অফিশিয়ালি বিদেশ ফেরত এবং প্রবাসীর কাছ থেকে তারা ডলার সংগ্রহ করছেন। বাস্তবে ডলারের একটি আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কেট আছে মতিঝিল, দিলকুশা পাড়ায়। বড় বড় মানি এক্সচেঞ্জগুলো বা তাদের প্রতিনিধিরা ঐ আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কেট থেকে ডলার সংগ্রহ করেন। সেখান থেকে ঢাকার নানা প্রান্তের মানিচেঞ্জাররা ডলার কিনে নেন।' আগস্ট মাসের ৩০ তারিখে রাজধানীর দৈনিক বাংলা মোড় ও গুলশানে চারটি মানি এক্সচেঞ্জে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ডলার ও টাকা উদ্ধার করেছে এনএসআই ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। অভিযানে প্রায় ২ লাখ মার্কিন ও কানাডীয় ডলার এবং ৩৮ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। আটক করা হয়েছে হুন্ডির কারবারে জড়িত একাধিক ব্যক্তিকে।

অভিযান চালিয়ে কি ডলারের দাম কমানো সম্ভব?

অভিযান চালানোর পর অনেক মানি এক্সচেঞ্জ তাদের ব্যবসা সাময়িক বন্ধ রেখেছেন বলে পত্রিকায় রিপোর্ট হয়েছে। অনেকে, যারা হুন্ডি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ডলার সংগ্রহ করতেন, তারা গা ঢাকা দিয়েছেন। আমাদের মনে আছে গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু পণ্যের দাম হঠাৎ বেড়ে গেলে যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়েছিল। তাতে, অনেক ব্যবসায়ী সাময়িকভাবে ব্যবসা বন্ধ করে দেন। ফলে ঐসব পণ্যের মূল্য আরও বেড়ে যায়। কার্ব মার্কেটে ডলারের ক্ষেত্রেও এবার তাই হয়েছে । হুন্ডিওয়ালারা যদি কেঁচো হয়ে থাকেন, তাহলে এই অবৈধ বাণিজ্যের সাপ কারা সেটা কি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা গোয়েন্দা সংস্থা খুঁজে বের করবে?

মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বললেন, এখন যারা 'ঘুষ' নিচ্ছেন, তারাও টাকার বদলে ডলারে 'ঘুষ' নিচ্ছেন। তাই বাধ্য হয়ে তাদের কার্ব মার্কেট থেকে উচ্চমূল্যে ডলার কিনে দিতে হচ্ছে। অপরদিকে, যারা বাইরে থেকে দেশে ফেরত আসছেন, তারাও কিছু ডলার নিজের কাছে রেখে দিচ্ছেন। সর্বোপরি, অনেকে তাদের গচ্ছিত টাকার একটি অংশ দিয়ে সামান্য ডলারও কিনে রাখছেন। এমন পরিস্থিতিতে, ভ্রমণের অফ সিজনে ডলারের মূল্য ৮৮ থেকে ১২০ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে।

যতদিন কার্ব মার্কেট (কালোবাজার) বলে একটি মার্কেট থাকবে, ততদিন ডলারের দু'রকম মূল্যও থাকবে। আর কার্ব মার্কেটের ডলারের সরবরাহ আসবে মূলত হুন্ডিওয়ালাদের কাছ থেকে। ফলে এখানে বেশি মূল্যে ডলার কিনতে হবে। ভারতে একাধিক প্রতিষ্ঠান ডলার কেনাবেচা করতে পারে। সেখানে অনেক আবাসিক হোটেল, প্রায় সব স্বর্ণ ব্যবসায়ী ডলার কেনাবেচার সঙ্গে জড়িত। এর বাইরে সেখানকার কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংক সব সময় আন্তর্জাতিক বাজার থেকে স্বর্ণ কিনে রিজার্ভে রাখছে। এতে করে রুপির মান চট করে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে না। ডলারের ঘাটতি হলে বা দাম বেড়ে গেলে স্বর্ণ ব্যবসায়ী বা হোটেল মালিকরা বাজারে ডলার ছেড়ে দিচ্ছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিক বাজার থেকে সহসাই স্বর্ণ কিনছে না। আর কার্ব মার্কেটে ডলার সরবরাহের কোনো বৈধ ব্যবস্থা নেই। এখানকার স্বর্ণ ব্যসায়ীরাও (দু'একজন বাদ দিয়ে) ডলার সংগ্রহ করেন না। ফলে, ডলারের সংকট হলে বাজারে ডলার পুশ করবে কে? বাংলাদেশ ব্যাংক এলসি খোলার জন্য উত্তপ্ত বাজারে (ব্যাংকগুলোর কাছে) মাঝে মাঝে ডলার বিক্রি করে থাকে। এখন খোদ বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছেই যথেষ্ট ডলার নেই।

উপায় তাহলে কী?

অর্থনীতিবিদরা এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বলে আসছে ডলারের মূল্য মার্কেটের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে ডলারের মূল্য নির্ধারিত হলে প্রবাসী শ্রমিকরা হুন্ডির মাধ্যমে দেশে ডলার রেমিট করার বিষয়ে উৎসাহিত হবেন। বাজারব্যবস্থার ওপর নির্ভর করলে এ পর্যায়ে ডলারের দাম বেড়ে যেতে পারে, বাংলাদেশি টাকা আরও বেশি অবমূল্যায়িত হতে পারে। কিন্তু এর বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সরকারের কাছে কোনো বিকল্পও নেই। বাজারের ওপর ডলারের মূল্য ছেড়ে দিলে এখনই এর দাম বেড়ে ১৫০ টাকা হয়ে যেতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র দেশপ্রেমের কথা বিবেচনা করে প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের কষ্টার্জিত আয় ব্যাংকিং চ্যানেলে পাঠাবেন না। মূল্যস্ফীতির কারণে তাদের দেশের পরিবারবর্গ বেশি মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। যে কারণে তারা হুন্ডি ব্যবসায়ীদের কাছে ডলার বিক্রি করছেন, যাতে কিছু বেশি টাকা পাওয়া যায়। ডলার যদি প্রকৃত সরবরাহ ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করে কেনাবেচা হতো তাহলে তারা হুন্ডি ব্যবসায়ীর কাছে ছুটতেন না। তারা ব্যাংকে প্রকৃত বাজারমূল্যে ডলার ট্রান্সফার করতে উৎসাহিত হতেন। এর বাইরে সরকার ও ব্যবসায়ীরা রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা তাদের রপ্তানি আয়ের একটি অংশ বাইরে রাখতে আগ্রহী। এমন সংকটময় মুহূর্তে সরকার তাদের কাছে সহায়তা চাইতে পারে। এজন্য সরকার তাদের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে পারে। ভবিষ্যতে যাতে বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়া স্বর্ণ ব্যবসায়ী, অন্যান্য ব্যাংকও ডলারের একটি রিজার্ভ ফান্ড করতে পারে যেখান থেকে সংকটের সময় ডলার পাওয়া যেতে পারে, সে ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের প্রায় ১০০ কোটি ডলার এখনো দেশে আসেনি। বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি এক নির্দেশনায় বলেছে যত শিগগির সম্ভব বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যেন আটকেপড়া ডলার দেশে আনবার ব্যবস্থা করে। আশঙ্কা এই ডলার হয়তো পাচার হয়ে থাকতে পারে।

লেখক
ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক
govindashil@gmail.com

যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে খাদ্য বন্ধ করেছে ইসরায়েল

রায়হান আহমেদ তপাদার

পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৭৩ সালে তৃতীয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর আরব দেশগুলোর সঙ্গে আর কোনো যুদ্ধ না হলেও ফিলিস্তিন-ইসরায়েল দ্বন্দ্ব-সংঘাত বন্ধ হয়নি। যদিও সংঘাত বন্ধে শান্তির ফরমুলা হিসেবে বিভিন্ন সময় দুই রাষ্ট্র সমাধানের কথা বলেছে, কিন্তু সেটা আর বাস্তবে রূপ নেয়নি। ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েল দুটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের সমাধান প্রথম এসেছিল ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘের মাধ্যমে। সে সময় বলা হয়, ইসরায়েল হবে ইহুদিদের জন্য এবং ফিলিস্তিন আরবদের জন্য। তবে ইহুদিরা মোট ভূখণ্ডের ১০ শতাংশের মালিক হলেও তাদের দেওয়া হয় মোট জমির অর্ধেক। যেটা আরবরা মানেনি। এরই ধারাবাহিকতাতেই হয় প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ। কিন্তু একটা সময় এসে ঠিকই ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন উভয়পক্ষই দুই রাষ্ট্র সমাধানে ঐকমত্য হয়। কিন্তু সেটা কীভাবে হলো? এবং পরে কেন আবার ব্যর্থও হলো সেটা একটা বড় প্রশ্ন। ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েল পৃথক দুটি রাষ্ট্রের ধারণা প্রথমবারের মতো বাস্তবতার দিকে এগোতে শুরু করে ১৯৯৩ সালে নরওয়ের অসলোতে ফিলিস্তিন-ইসরায়েলের শান্তিচুক্তির মাধ্যমে। যেটা 'অসলো অ্যাকর্ড' নামে পরিচিতি।

অসলোতে দুই রাষ্ট্র সমাধান মেনে নেওয়া হলেও সেই রাষ্ট্র কবে গঠন হবে তার কোনো সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। এমনকি ইসরায়েলের বাইরে আলাদা একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চারটি বিষয়েরও কোনো সমাধান করা হয়নি। এখানে মূল বিষয়গুলো হচ্ছে– দুই রাষ্ট্রের সীমান্ত কোথায়, কীভাবে নির্ধারণ হবে সেটা। জেরুজালেম কার অধীনে থাকবে। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের ভেতরে থাকা ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের কীভাবে সরিয়ে নেওয়া হবে। এবং ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের পর থেকে ইসরায়েলের ভেতরে থাকা যেসব ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, তারা ইসরায়েলে কীভাবে ফিরবেন। চুক্তিতে বলা হয়েছিল, পাঁচ বছরের মধ্যে একটি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ গঠনের পর এগুলো আলোচনার ভিত্তিতে পরে ঠিক করা হবে। কিন্তু সেটা আর কখনোই হয়নি। ১৯৯৬ সালে ইসরায়েলে ডানপন্থিরা ক্ষমতায় আসার পর ইসরায়েলের সরকারও আর শান্তি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে চায়নি। পরবর্তী বছরগুলোতে বিভিন্ন সময় দুই পক্ষের বৈঠক হলেও সমাধান আসেনি।

এ সময় ইসরায়েল মূলত নজর দিয়েছে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণের ওপর এবং জেরুজালেমকে তারা ইসরায়েলের রাজধানীও ঘোষণা করেছে। আমেরিকা সেটাকে স্বীকৃতিও দিয়েছে। সব মিলিয়ে এখন যে বাস্তবতা তৈরি হয়েছে, তাতে করে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কি-না তা নিয়ে অনেকের মধ্যেই সন্দেহ রয়েছে।

এদিকে ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান সংঘাত নিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের বক্তব্যেও প্রতিক্রিয়ায় চরম ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে ইসরায়েল। জাতিসংঘের কর্মীদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সরকার। আন্তোনিও গুতেরেসের পদত্যাগ দাবি করে তেল আবিব আরও হুমকি দিয়েছে, জাতিসংঘকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে এবার। সম্প্রতি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, ইসরায়েলে ভয়ংকর এক হামলা চালিয়েছে হামাস। তবে এ হামলা যে হঠাৎ শূন্য থেকে হয়নি, এটাও সবাইকে বুঝতে হবে। ফিলিস্তিনের জনগণ ৫৬ বছর ধরে শ্বাসরুদ্ধকর দখলদারির শিকার। তারা তাদের ভূখণ্ড দখল করে অবৈধ ইহুদি বসতি দেখেছেন। তারা সহিংসতায় জর্জরিত হয়ে চলেছেন। জাতিসংঘ প্রধান আরও বলেন, গাজায় ইসরায়েল যা করছে, তা স্পষ্টতই আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্দশা যেমন হামাসের ভয়ংকর হামলার ন্যায্যতা দিতে পারে না। তেমনি আবার এ হামলার জেরে জাতিগতভাবে ফিলিস্তিনি জনগণকে শাস্তি দেওয়া কখনো ন্যায্যতা পেতে পারে না।

গুতেরেসের বক্তব্যের পরপরই ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া জানায় ইসরায়েল। গুতেরেসের এ মন্তব্যের পর সেদিনই তার পদত্যাগ দাবি করে বক্তব্য দেন জাতিসংঘে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত গিলার্ড এরডান। তিনি বলেন, গুতেরেস জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত নন। তার পদত্যাগ করা উচিত। ইসরায়েলের এক সংবাদমাধ্যমকে এরডান বলেন, গুতেরেসের বক্তব্যের কারণে আমরা জাতিসংঘের কর্মীদের ভিসা দেব না। ইতিমধ্যে জাতিসংঘের মানবিক ত্রাণসহায়তা বিষয়ক প্রধান মার্টিন গ্রিফিথসকে ভিসা দেওয়া হয়নি। এরপরও গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য আবারও আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ।

> সংস্থাগুলো বলছে, তাদের কাছে যে খাবার আছে, তা দিয়ে এতসংখ্যক মানুষের চাহিদা মিটছে না। দাতব্য সংস্থা অক্সফাম বলছে, গাজাবাসীর বিরুদ্ধে অনাহারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সংস্থাটি বলছে, যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে খাদ্য বন্ধ করে দেওয়াকে কোনোভাবেই বৈধতা দেওয়ার সুযোগ নেই

তবে সহিংসতা বন্ধে বিভক্ত হয়ে পড়েছে বিশ্ব। আরব বিশ্বের পাশাপাশি রাশিয়া ও চীন যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানালেও পশ্চিমা দেশগুলো এখনো ইসরায়েলের অব্যাহত হামলা চালানোর অনড় অবস্থানের পক্ষে। এদিকে গাজায় খাবার ও পানির তীব্র হাহাকার চলছে। আগে থেকেই নাজুক পরিস্থিতিতে থাকা গাজার বাসিন্দাদের এখন অনাহার-অর্ধাহারে দিন কাটছে। জাতিসংঘ বলছে, ইসরায়েলি হামলায় গাজার অর্ধেকের বেশি বাসিন্দা গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। সামান্য ত্রাণসহায়তায় নির্ভরশীল তারা। দাতব্য সংস্থাগুলোর দেওয়া খাবারের জন্য মানুষের দীর্ঘ সারি দেখা যাচ্ছে গাজা জুড়ে। সংস্থাগুলো বলছে, তাদের কাছে যে খাবার আছে, তা দিয়ে এতসংখ্যক মানুষের চাহিদা মিটছে না। দাতব্য সংস্থা অক্সফাম বলছে, গাজাবাসীর বিরুদ্ধে অনাহারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সংস্থাটি বলছে, যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে খাদ্য বন্ধ করে দেওয়াকে কোনোভাবেই বৈধতা দেওয়ার সুযোগ নেই। গাজায় অব্যাহত বোমাবর্ষণে ক্ষতির শিকার হওয়ার পাশাপাশি জ্বালানি, ওষুধ ও চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী সংকটে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক গাজার হাসপাতাল। এতে করে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় চরম বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক গবেষকরা মনে করেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন করা খুবই চ্যালেঞ্জিং, এটা বাস্তবায়ন করা ১৯৯০-এর দশকের তুলনায় খুবই কঠিন। কারণ, পশ্চিম তীর এবং জেরুজালেমের ইহুদি বসতি। ১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তির সময় এটা ছিল এক লাখ ২০ হাজার। গেল তিন দশকে ইহুদি বসতিস্থাপনকারী বেড়ে হয়েছে সাত লাখ। এছাড়া খোদ ইসরায়েলের আইন অনুযায়ীই অবৈধ এরকম ইহুদি বসতিও আছে। এরকম বসতি সম্প্রসারণ এবং ইসরায়েলের রাজনীতিতে এর প্রবল সমর্থনের কারণে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন কঠিন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া দুই রাষ্ট্র সমাধানের প্রতিও এখন আর ইসরায়েলের আগ্রহ নেই। অন্যদিকে ফিলিস্তিনিরাও হামাস এবং ফাতাহ দুই দলে বিভক্ত। এবং তাদের মধ্যে ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য কথা বলা বা শান্তি প্রক্রিয়া এগুনোর মতো একক এবং বিশ্বস্ত নেতা নেই। তাহলে কি দুই রাষ্ট্র সমাধান আর সম্ভব নয়? ইসরায়েলের তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেইর লিটভ্যাক অবশ্য বলছেন, সুযোগ এখনো আছে। কিন্তু ইসরায়েল কি দুই রাষ্ট্র সমাধান আর চায়? লিটভ্যাক বলছেন, ইসরায়েল সেটা চায় না। তারা যেটাকে সমাধান মনে করে সেটা হচ্ছে, পরিস্থিতি যেভাবে আছে, সেভাবেই থাকুক। কিন্তু ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের মধ্যে এখন যে নতুন যুদ্ধাবস্থা, সেখানে যুগের পর যুগ ধরে চলে আসা অচলাবস্থার পরিবর্তন কে করবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তির উদ্যোগ নিলে সুফল আসতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে আমেরিকা যখন মধ্যপ্রাচ্যে কিছু করতে চেয়েছে, তখন সেটার বাস্তবায়নও হয়েছে। মিসর-ইসরায়েল শান্তিচুক্তি, জর্ডানের সঙ্গে চুক্তি এমনকি সাম্প্রতিককালে আব্রাহাম অ্যাকর্ড-এর সবগুলোর পেছনে আমেরিকার ভূমিকা আছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে আমেরিকার আগ্রহ আছে কিনা, এমন প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। দুই যুগ আগে নাইন-ইলেভেনের পর আমেরিকার চোখ অসলো শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন থেকে সরে যায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। সেটা শেষ হলে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে ইরান, রাশিয়া, চীন নিয়ে। কিন্তু এখন আমেরিকাকে আবারও মধ্যপ্রাচ্যে সক্রিয় হতে হচ্ছে। কারণ এখানে অবহেলা করলে এর ফল সবাইকেই ভোগ করতে হবে, কিছু সময় পর পর সংঘাত সামনে আসবে। আমেরিকা শান্তির উদোগ নিলে হয়তো সেটা আশা দেখাতে পারে। কিন্তু এখন ইসরায়েল-গাজা সংকট যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের দিকে এগুচ্ছে, সেখানে আমেরিকা-ইসরায়েল কিংবা হামাস, শান্তির কথা কেউই বলছে না। সংকটটা এখানেই। যাইহোক শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি কোনদিকে মোড় নেয় তা সময়ই বলে দেবে।

লেখক
গবেষক ও কলাম লেখক
raihan567@yahoo.com

শ্রদ্ধাঞ্জলি

তিনি ছিলেন জলবায়ু ন্যায্যতার প্রতীক

নাজমুল আহসান

সালিমুল হক
(২ অক্টোবর ১৯৫২-২৮ অক্টোবর ২০২৩)

স্বল্প পরিসরে হলেও প্রফেসর সালিমুল হকের কাজের সঙ্গে আমার যুক্ত থাকার সুযোগ হয়েছে। বাংলাদেশে জলবায়ু ন্যায্যতার আন্দোলনে তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি। দীর্ঘ তিন দশক ধরে তিনি পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের মতো ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর হয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেন-দরবারে তার ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা ও উন্নত দেশকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে তার যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। অনেক ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পক্ষ হয়ে যারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেনদরবার করতেন তাদের উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করতেন তিনি। তার দীর্ঘ কর্মজীবনে জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ও গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদে কাজ করেছেন। জানা যায়, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে তিনি পরামর্শকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তঃসরকারি প্যানেলের (আইপিসিসি) অভিযোজন সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরিতে তার কেন্দ্রীয় ভূমিকা ছিল। এখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশমনের পাশাপাশি অভিযোজন একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়।

অভিযোজন করতে পারার একটা সীমা আছে তাই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু ক্ষয়ক্ষতি তহবিল গঠন সম্পর্কিত আলোচনায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে তিনি সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি মনে করতেন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ক্ষয়ক্ষতি তহবিল থেকে সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার আছে। উন্নত দেশগুলোর কাছে জলবায়ু অভিযোজন ও ক্ষয়ক্ষতি তহবিল গঠন কখনো অগ্রাধিকার ছিল না। প্রফেসর হক এক্ষেত্রে সবসময়ই সচেষ্ট ছিলেন। তাদের প্রচেষ্টার ফলে ২৭তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন, শারম-আল-শেখে বিশ্ব-নেতারা জলবায়ু ক্ষয়ক্ষতি তহবিল গঠনে একমত হন। তিনি ছিলেন আসছে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২৮) প্রেসিডেন্সির একজন উপদেষ্টা এবং তিনি এই সম্মেলনে ক্ষয়ক্ষতি তহবিল সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রত্যাশায় ছিলেন।

জাতিসংঘের নবগঠিত বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা বোর্ডের বাহ্যিক সদস্য ছিলেন প্রফেসর সালিমুল হক। বিজ্ঞানের জগতে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনার পেছনে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একটি তালিকা গত বছর প্রকাশ করে বিজ্ঞান সাময়িকী 'নেচার'। দশজনের এই সংক্ষিপ্ত তালিকায় তার নাম ছিল। ৭১ বছর বয়সে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইইউবি-এর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইসিসিসিএড)-এর পরিচালক ছিলেন। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে বিষয়গত ধারণার পাশাপাশি, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অভিজ্ঞতা তার কাজের কেন্দ্রীয় ভূমিকায় ছিল। জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবিলায় তিনি সর্বদা নতুন নতুন ধারণা নিয়ে আসতেন এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে কীভাবে ক্ষমতায়ন করা যায় সে নিয়ে ভাবতেন। ক্ষয়ক্ষতি তহবিল নিয়ে তার কাজ শুধু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টিই নয়, অর্থনীতি-বহির্ভূত ক্ষয়ক্ষতিকেও আলোচনায় গুরুত্ব দিয়েছেন। গবেষণার ফলাফল ও গণমানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পত্র-পত্রিকায় জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ইস্যু নিয়ে লেখালেখি করতেন। এর মাধ্যমে তিনি যেমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু সম্পর্কিত বিতর্কগুলো আলোচনায় রাখতেন এবং তেমনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে তথ্য-উপাত্ত সহকারে তুলে ধরতেন।

তার সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্ততার সময় দেখেছি বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের সঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে তিনি কতটা সংবেদনশীল। তিনি সবসময় যুব ও প্রান্তিক সংগঠনের সঙ্গে কাজ করতে চাইতেন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তাদের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তিনি যুব সংগঠনগুলোকে সাহায্য করতেন যাতে তারাই জলবায়ু ন্যায্যতার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। তার কাজের অন্যতম ক্ষেত্র ছিল কীভাবে এই যুবদের দক্ষতা বাড়ানো যায়। তিনি যুবদের সবসময় জলবায়ু ন্যায্যতার আন্দোলনে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি তাদের অভিযোজন ও প্রশমন সম্পর্কিত উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিতেন ও এজন্য উৎসাহ দিতেন। কথা হচ্ছিল এমন একজন যুব জলবায়ু ন্যায্যতার আন্দোলনের কর্মী, ইয়ুথনেট ফর ক্লাইমেট জাস্টিসের নির্বাহী সমন্বয়কারী, সোহানুর রহমানের সঙ্গে যিনি প্রফেসর হকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন, তিনি বলছিলেন, 'সালিম স্যার জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ক্ষতিপূরণের লড়াই করে গেছেন। তেমনি তিনি স্থানীয় মানুষের নেতৃত্বে যাতে অভিযোজন হতে পারে সেই ধারণারও একজন দিকপাল ছিলেন। উনি যেভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতেন সেটা ছিল অবিশ্বাস্য। উনি সবাইকে অনুপ্রাণিত করতেন বিশেষ করে তরুণ ও শিশুদের। দারুণ রকমের আশাবাদী মানুষ ছিলেন তিনি। তার মৃত্যুতে আমরা আমাদের জলবায়ু সুবিচার আন্দোলনের এক বড় সমর্থককে হারালাম।'

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনায় প্রফেসর সালিমুল হকের অন্যতম অবদান হচ্ছে অভিযোজন প্রক্রিয়ায় স্থানীয়করণ সম্পর্কিত ধারণার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। তিনি সবসময় মনে করতেন অভিযোজন হতে হবে স্থানীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে এবং এজন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যথেষ্ট বিনিয়োগ করা দরকার। এই প্রক্রিয়ায় তিনি অভিযোজনে স্থানীয় কমিউনিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কাঠামোগত অসাম্য দূর করা, স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকি বিশ্লেষণ আরও বেশ কিছু বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

সালিমুল হক বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতেন। জলবায়ু ন্যায্যতা আদায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন একশনএইড বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ্ কবির, তিনি স্মৃতিচারণ করছিলেন, 'প্রফেসর সালিমুল হক এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি বিশ্বকে জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুত্ব এবং একে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখতেও ভূমিকা পালন করেছেন। যদিও তার মতো ব্যক্তিত্বকে কোনো একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা কঠিন– কারণ তার জ্ঞান ও চিন্তার পরিধি ছিল বিশাল। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত শুধু সমস্যাই না এর সমাধানকে বিশ্বের কাছে বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের কাছে নিয়ে যেতে পেরেছেন। বিশ্ব-নেতাদের কাছে উন্নয়নশীল বিশ্বের দাবিকে তুলে ধরতে পেরেছেন। তার সঙ্গে কাজের মাধ্যমে আমি তাকে ন্যায্যতার প্রতীক হিসেবেই জেনেছি। তিনি তার চিন্তা দিয়ে আমাদের পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তিনি বলতেন পরিবর্তন সম্ভব। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি প্রফেসর হক একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন যিনি এই বিশ্বকে ভালোবাসতেন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ভূমিকার মাধ্যমে তিনি তার প্রমাণ রেখে গেছেন।'

বর্তমান সময়ে প্রফেসর সালিমুল হকের মতো মানুষের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি, তার এই চলে যাওয়া বাংলাদেশ তো বটেই, উন্নয়নশীল বিশ্ব, এমনকি পৃথিবীর জলবায়ু ন্যায্যতা আদায়ের আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

লেখক : উন্নয়নকর্মী ও কলামিস্ট
psmiraz@yahoo.com